বিজেপি-তৃণমূল রাজনৈতিক সম্পর্কের আসল রূপ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যেকার সম্পর্ক আসলে কি রকম এটা নিয়ে বাংলার রাজনীতি কেবল নয় গোটা দেশের রাজনীতিতেই কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এবং এই প্রশ্নের কোনও সোজা-সাপটা উত্তর চট করে আসবে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু সোজা চোখে তাকিয়ে এই দুই দলের মিল কোথায়, অমিলও বা কতটা – তার একটা চিত্র ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। এমনিতে পূর্বঘোষিত কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতিগত অবস্থান বামপন্থী ছাড়া আর কারোর নেই। সাম্প্রদায়িক দলগুলির বিষয় স্বতন্ত্র। বাকি দলগুলোর কাছে সেই মুহূর্তের কৌশলটিই শেষ কথা। আজ যদি তৃণমূল এবং বিজেপি'র মধ্যে কোনও নির্বাচনী বোঝাপড়া না হয়, তার মানে আগামীকাল এরকম কোনও বোঝাপড়া হবে না তা নয়। তা হতেই পারে। কাজেই একটি নির্বাচনী বোঝাপড়া দিয়ে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের চরিত্র সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। বরং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সেই রাজনৈতিক দলের চরিত্রগুলিকে অনুধাবন করাটাই এই মুহূর্তে আমাদের কাজ। এবং এই চরিত্রগুলোর মধ্যেকার মিল এবং অমিলকে জানা-বোঝার চেষ্টা করাটা জরুরি।

বিজেপি'র যে চরিত্রটি সবচেয়ে জোরালো ভাবে সামনে আসছে তা হলো দুর্নীতি। অনেকগুলো রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে এরা পরিচালনা করেছে–বাস্তব হচ্ছে সেগুলি খুব দুর্নীতিকে উৎসাহ দিয়েছে এ অভিযোগ আসেনি। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার সম্পর্কে যে অভিযোগটি আসছে তা হলো এই সরকার শুধু দুর্নীতিপরায়ন নয়, দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন সরকার। মেহুল চোকসি বা নীরব মোদী, বিজয় মালিয়া, এমনকি সর্বশেষ নীতিন সন্দেসার। এই প্রতিটি দুর্নীতির বা চুরির মধ্যে কতগুলো সাধারণ চরিত্র আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে টাকা চুরি হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে। নীরব মোদী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ১৩৭০০ কোটি টাকা গায়েব করে পালিয়েছেন। এই কাজে তার সঙ্গী তার মামা মেহুল চোকসি। দু'জনেই টাকাটা চুরি করে পালিয়েছে। নীরব মোদি হংকং-এ এবং মেহুল চোকসি পালিয়েছেন ক্যারিবিয়ানের ছোট দেশ অ্যান্টিগা ও বারমুডায়, কেবল তাই না সেখানকার নাগরিকত্বও পেয়ে গেছেন। চোকসির নাগরিকত্বের আবেদনে মুম্বাই পুলিশের সার্টিফিকেটও আছে, 'তার বিরুদ্ধে ভারত 'সরকারের কোন অভিযোগ নেই'। অভিযোগ আসছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যভাবে, চোকসি যাতে নাগরিকত্ব পায় সে বিষয়ে অ্যান্টিগার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আরেক কৃতী পুরুষ নীতিন সান্দেসারা ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ৪৭০০ কোটি টাকা চুরি করে সপরিবার পালিয়েছেন নাইজেরিয়ায়।

এই তালিকাকে দীর্ঘ না করেই মূল প্রবণতাগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। এক, টাকাগুলো চুরি হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে। দুই, প্রতিটি ক্ষেত্রে এই চুরিতে সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয়

সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীসহ বাকি মন্ত্রীরা। বিজয় মালিয়া চুরি করে পালানোর আগে শেষ আশির্বাদ নিয়ে গেছে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কাছ থেকে খোদ সংসদ ভবনে বসে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের টাকা মানে সাধারণ মানুষের টাকা। অতীতে আমাদের দেশের আইন ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে মানুষের টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব সরকারে। এই সব চুরি শুরু হবার এক বছর আগে নরেন্দ্র মোদী সরকার আইন পালটে সরকারের এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে শুরু করে। রঘুরাম রাজন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে সে টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারও প্রায় করেননি। এর ফল হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দেওয়া হয়নি সাড়ে এগারো লক্ষ কোটি টাকা। গোটাটাই সাধারণ মানুষের টাকা। এরকম লুট ঘটছে আকচার।

দেশের যে ব্যবসায়ীর না-মেটানো ব্যাঙ্কের ধার সবচেয়ে বেশি তার নাম অনিল আম্বানি। অনিল আম্বানির টেলিকম কোম্পানিরই বাজারে ধার ৪০,০০০ কোটি টাকার বেশি। একটা হিসাবে অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলোর মোট বকেয়ার পরিমাণ ১,২৫ লক্ষ কোটি টাকা। মোদীর আর এক ঘনিষ্ঠ আদানিদের ব্যাঙ্কের ধারের পরিমাণ ৯৬,০৩১ কোটি টাকা। এই তালিকাকে দীর্ঘ না করে যে প্রবণতাটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো লুট হচ্ছে সাধারণ মানুষের টাকা এবং তা লুট হচ্ছে সরকারি বা রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এর বিনিময়ে লুটের একটা ভাগ এই নেতারা পায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং এই কাজটি করতে প্রশাসনেরও একটা অংশের নিশ্চিত সহযোগিতা লাগে। মোদ্দা কথা বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং সরকারের মধ্যে এক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চলছে এই অর্থনীতি। বৃহৎ ব্যবসার নেতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের যৌথ উদ্যোগে এই অপরাধমূলক অর্থনীতি পরিচালিত হয়। এবং এই অর্থনীতির একটি নামকরণও করেছে অর্থনীতিবিদরা। বলা হচ্ছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম, বাংলায় লুটেরা পুঁজিবাদ বা ধান্দার পুঁজিবাদ। রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক এই কারণে এই ধান্দার পুঁজিবাদের রাজনৈতিক চরিত্র থাকে। এই ধান্দার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথটিও রাজনৈতিক। বিজেপি এই দলটি এই অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিনপ্রেমী বিজেপি ধান্দার পুঁজিবাদের আগ্রাসী অনুসারী একটি রাজনৈতিক দল।

আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির কোন আলাদা চরিত্র থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু লুটেরা পুঁজিবাদের চরিত্রে শাসক দলের একটা নির্দিষ্ট ছাপ পড়বে। আগামী লোকসভা নির্বাচন আমাদের দেশের ধান্দার পুঁজিবাদের পক্ষেও একটা পরীক্ষা। লোকসভা ভোট হবে বিজেপি বনাম বাকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মধ্যে। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধান্দার পুঁজিবাদের বিরোধী চরিত্র থাকবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নেই বরং বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের একটা বড় অংশই এই অর্থনীতির পক্ষে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। একমাত্র বামপন্থীরাই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে এবং ধান্দার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করতে পারে।

আমাদের রাজ্যের শাসক দলের রাজনৈতিক প্রবণতা থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি তারা কোন দিকে যেতে চায়। একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তৃণমূল কংগ্রেসের এমন

কোনও রাজনৈতিক প্রবণতা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটা রাজ্য বা রাজ্যের মানুষের পক্ষে সহায়ক। এই দল স্বৈরাচারী বললে যথেষ্ট বলা হয় না, অন্য নির্বাচন বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় বলা যায় এই দলটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে স্বৈরাচারী দল, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি যার ন্যূনতম শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা নেই দেশের সংবিধানের স্বীকৃত মানুষের অধিকারের প্রতি। তৃণমূলের সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুর্নীতি হলো সারদা কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারির বিস্তারিত বিবরণ না দিয়েও মূল বিষয়টি ছিল এই চিট ফান্ডটির কাজ ছিল সাধারণ মানুষকে এই লোভ দেখানো–অল্প টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণে টাকা তারা পেতে পারে। কোম্পানির হিসাব ছিল, এই লোভে আরও বেশি বেশি মানুষ টাকা জমা রাখবে। ফলত প্রথম যারা বিনিয়োগ করেছে তাদেরকে বাড়তি টাকা দেওয়া কেবল না, কোম্পানিও যথেষ্ট লাভ করবে। এই ব্যবসার একটি শর্ত প্রতিনিয়ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ বাড়বে। অর্থনীতির কোনও নিয়মে এটা সম্ভব নয়। কারণ অর্থনীতিতে ওঠা নামা থাকবেই। ওঠানামাহীন অর্থনীতি তৈরি হতে পারে একমাত্র তখনই যখন নামার বিষয়টিকে আটকে দেবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সরকারি হস্তক্ষেপ।

ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা ধান্দার পুঁজিবাদের কথা প্রথম বলে মার্কিনী বিশেষজ্ঞরা। তারা উদাহরণ হিসাবে হাজির করে ফিলিপিন্স-এর স্বৈরশাসক ফার্দিনান্দ মার্কোসকে। এই মার্কিন অনুগত চরম দক্ষিণপন্থী স্বৈরশাসক ২০ বছর ধরে ফিলিপিন্স শাসন করেন। তার স্বৈরশাসন তার অনুগত শিল্পপতিদের হাতে গোটা ফিলিপিন্সকে তুলে দেয়। আটজন বড় ব্যবসায়ীকে (অক্টোপাস গ্যাং বলে কুখ্যাত) ডেকে মার্কোস ফিলিপিন্সের অর্থনীতির একেকটি অংশের একচেটিয়া অধিকার একেক জনের হাতে তুলে দেয়। তাদের লাভের গ্যারান্টি সরকার দেবে। বিনিময়ে মার্কোস পরিবার পেয়েছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার গভীর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ফিলিপিন্স লুট এবং ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে ছিল। এরকম একটি ব্যাবস্থার প্রাথমিক শর্ত ছিল সরকার হবে স্বৈরাচারী।

ফিলিপিন্স ছেড়ে আমরা যদি ফিরে আসি নিজেদের দেশে আমরা দেখব প্রবণতাগুলো এক। চিট ফান্ডের সাফল্য নির্ভর করে বিনিয়োগকারীর এই বিশ্বাসের ওপর যে বিনিয়োগ বেড়েই যাবে। এই বিশ্বাস অর্থনীতির নিয়ম তৈরি করে না, তৈরি করে চিট ফান্ডের পেছনে সরকার এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের খুল্লামখুল্লা মদত। একেকজন মন্ত্রী একেকটি চিট ফান্ডের মদতদাতা হিসাবে আবির্ভূত হন। কেবল মন্ত্রী না, গুরুত্বপূর্ণ আমলারাও এই ভূমিকায় হাজির হন। একজন পুলিশের বড় কর্তা তদন্তের নামে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাফিস করে দেন। জন্মমুহূর্ত থেকে তৃণমূল নীতিহীন এবং দুর্নীতিপরায়ন দল একথা বামপন্থীরা বলেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরমুহূর্ত থেকে চিটফান্ডের ব্যাবসার সাথে মুখ্যমন্ত্রী নিজে, তাঁর পরিবার এবং তাঁর মন্ত্রিসভা এবং তাঁর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লুটের উৎসবে। প্রক্রিয়ায় কিছু ফারাক ছিল–মুখ্যমন্ত্রী লুট করলেন ছবি বিক্রির নামে। বাকিরা শুরুতে চিট ফান্ড নির্ভর থাকলেও বিষয়টা প্রসারিত হলো অন্যক্ষেত্রে। কেউ যে কথা কোনদিন ভাবতে পারেনি তাই হতে শুরু করল এরাজ্যে। কয়লাখনি অঞ্চল থেকে কয়লা ভর্তি যেকটি ট্রাক বেরোয় কয়লা মাফিয়ারা সেই অনুযায়ী উপঢৌকন পৌঁছে দেয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কাছে। ফার্দিনান্দ মার্কোস এই লুটের বিষয়টিকে ঐতিহাসিক মাত্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তার 'সাফল্যের' শর্ত ছিল

দুটি– এক, চূড়ান্ত স্বৈরাচার, কখনও ভোট হবে না। কাজেই মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। দুই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন। বাইরের থেকেও কেউ কিছু করতে পারে না। ফিরে আসুন আমাদের রাজ্যে। কোন সুস্থ ভোট এরাজ্যে হবে না, তৃণমূল রাজত্বে একটিও অবাধ ভোট এরাজ্যে হয়নি। কাজেই জনগণের রাগের বহিঃপ্রকাশ হবার কোন সুযোগ নেই। দুই, বাইরের কোন শক্তি, ধরা যাক সিবিআই কিছু করবে না, কারণ বিজেপি সরকারের মদত তৃণমূল সরকার পাবে। নিঃসন্দেহে এতে দুই দল এবং দুই সরকারের মধ্যেকার দরকষাকষির বিষয় থাকবে। কিন্তু কোনও পারস্পরিক বিচ্ছেদ হবে না। মুখে বিজেপি'র বিরোধিতা করে যাতে বিজেপি বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেটাই মমতা ব্যানার্জির প্রধান উদ্যোগ। কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি কথাটা একটি চিরকালীন সত্য। নেত্রী এখন ধরা পড়ে যাচ্ছেন। বামপন্থীরা যখন তৃণমূলের দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারের কথা বলেছে অধিকাংশ বিরোধী দল তা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারাও দেখতে পাচ্ছে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে সক্রিয় নেতৃত্ব দিচ্ছে বামপন্থীরা। দেশকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলন। বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তি এটা মেনে নিয়েছে লাল পতাকায় মোড়া কৃষক আন্দোলনই বিজেপি'র পতনকে ডেকে আনবে। আরও একটি ঝড় উঠল –৮ এবং ৯ জানুয়ারি দেশজোড়া শ্রমিক ধর্মঘটে।

কিন্তু দেশজোড়া 'অক্টোপাস গ্যাং' এবং শাসক বিজেপি আর মোদী সরকারের যৌথ উদ্যোগ শক্তিও সমান সক্রিয়। তথাকথিত ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'র শক্তি সরকারের সমস্যা হয় পালানোর সময়টায়। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'র দুই পার্টনার সরকার এবং ব্যবসায়ীর সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন হয়। এক পার্টনার পালাচ্ছে, আর এক পার্টনারের দায়িত্ব তাকে ধরার। এতে অবশ্য পালানো সহজ হয়, যেখানে চোকসিরা সহজে পালালেন পার্টনার মোদী সরকারের 'চোখে ধুলো দিয়ে'।

এই উত্তেজনাপূর্ণ পালানোর নাটক অভিনীত হলো আমাদের রাজ্যেও। কালিম্পঙ-এর ডেলো বাংলোয় মধ্য রাত্রে দুই পার্টনার বোঝাপড়াকে অক্ষুণ্ণ রেখে রাজ্য সরকারের 'চোখে ধুলো' দিয়ে সারদার মালিক সুদীপ্ত সেন পালালেন। রহস্যময়ী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। হেয়ালি করে বললেন পালিয়েছে উত্তর দিকে। সুদীপ্ত সেন গ্রেপ্তার হলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু হলো না রাজনৈতিক রাঘব বোয়ালদের। তৃণমূলের সাংসদ কুণাল ঘোষ সারদা কোম্পানি থেকে প্রতি মাসে ১৬ লক্ষ টাকা বেতন নিতেন। পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্র, সারদার কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এবং প্রকাশ্যেই সারদা চিট ফান্ডে টাকা জমা দেবার পক্ষে প্রচার করতেন। মালিক সুদীপ্ত সেন ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা 'ছবি' কিনেছিলেন।

সরকারি সার্কুলার দিয়ে সারদা গ্রুপের সংবাদপত্র প্রতিটি লাইব্রেরিতে কিনতে বলেছিল। এগুলি দু'একটি প্রকাশ্যে আসা ঘটনা। প্রকৃত ঘটনা এর থেকে অনেক বেশি।

যে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে অনেক বেশি তোলপাড় হয় তা হলো তৃণমূল এবং বিজেপি'র মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের সংক্রিয় অংশগ্রহণ করে এই দুটি রাজনৈতিক দল– যা তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং এ প্রশ্নে দুটি দলের চরিত্র এক। গোটা দেশের অর্থনৈতিক বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি এরজন্য তার কাজের পরিধিটি অনেক বড়, তুলনায় তৃণমূলের পরিধি অনেক ছোট – কিন্তু

চরিত্র একই। এই দুই দলের রাজনৈতিক সম্পর্ক অনেক সময়ই অভিন্ন অর্থনৈতিক চরিত্রকে আড়াল করতেও ব্যবহৃত হয়।

বিজেপি'র বর্তমান সরকার তর্কাতীতভাবে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন সরকার। দলের নাম এক হতে পারে দলের স্লোগানও একই হতে পারে, এমনকি আনুষ্ঠানিক নীতিও এক হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের চরিত্রে স্থায়ী পরিবর্তন এনে দিয়েছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। এই মুহূর্তে দু'ধরনের রাজনৈতিক দল, এক, যারা ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অংশীদার, আর একটি অংশ যারা এর বিরোধী। বিজেপি এবং তৃণমূল দুটিই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অনুসারী রাজনৈতিক দল। স্বল্প সময়ের ঘটনাবলীতেই বোঝা যায়, মূল চরিত্রের কোন পার্থক্য নেই।

দেশের ক্ষমতায় থাকার কারণে বিজেপি এখন অনেক বেপরোয়া, বর্তমান দেশের প্রতিটি দুর্নীতি, চুরি এবং লুটের অংশীদার। এই দীর্ঘ তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের টাকা চুরি হচ্ছে, সরকারি টাক লুট হচ্ছে সরকার এবং সরকারি দলের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষ। কিন্তু সরকার প্রত্যক্ষভাবে একজন ব্যবসায়ীকে সরকারি টাকা পাইয়ে দিচ্ছে এই নির্লজ্জ নজির রাফাল বিমান কেলেঙ্কারি। অনিল আম্বানিকে নরেন্দ্র মোদীর সরকার টাকা পাইয়ে দিল প্রত্যক্ষভাবে। রাফালে বিমান কেনাটা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা বরাত। যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত যে কোনও ক্রয়বিক্রয়ে সরকারের সহযোগী থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকাল লিমিটেড। নানা কারণে আমাদের দেশ প্রতিরক্ষা সামগ্রীর অন্যতম সর্ববৃহৎ ক্রেতা। এবং এর বিমানবাহিনীর অংশটিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে হ্যাল (হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকাল লিমিটেড), বিদেশী যুদ্ধ বিমানের মেরামতি করে মূল কোম্পানির ডিজাইন মতো বিমান তৈরি করে নেয়। এবং এই কাজ করতে করতে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে যুদ্ধ বিমান তৈরি করে হ্যাল। যেমন তেজাস, হালকা এই যুদ্ধ বিমানটি কেবল ভারতীয় বিমানবাহিনী ব্যবহার করে, তাই কেবল না– তেজাস আমরা অন্য দেশকে বিক্রিও করি, নয়া-উদারনীতির যুগে রাষ্ট্রায়ত্ত হ্যাল একটি বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হয়েছে। রাফালে বিমান নিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবে সহযোগী হবে 'হ্যাল'। রাফালের নির্মাতা দাসোর সাথে হ্যালের চুক্তি হয় ৩০হাজার কোটি টাকার। এই চুক্তিটি বাতিল করে গোটা টাকাটা তুলে দেওয়া হয় অনিল আম্বানির ডিফেন্স কোম্পানির হাতে। এই কোম্পানি যুদ্ধবিমান তৈরি করার প্রশ্নে সহযোগিতার চুক্তি করল, যুদ্ধবিমান দূরে থাক এরা কোনদিন একটি খেলনা এ্যারোপ্লেনও তৈরি করেনি। প্রধানমন্ত্রী রাফালে বিমান কেনবার ঘোষণা করার মাত্র বারো দিন আগে রিলায়েন্স ডিফেন্স লিমিটেড নামক কোম্পানিটির জন্ম। এই কোম্পানিটিকেই রাফালের সাথে চুক্তি করতে বলা হয়। এই কোম্পানিকে যুদ্ধবিমান তৈরি করার অনুমতি যখন প্রতিরক্ষা দপ্তর দেয় তখনও কোম্পানিটির নামে কোন জমি ছিল না, কোন অফিস ছিল না। রামভক্ত প্রধানমন্ত্রী সত্যি সত্যি রামের জন্মের আগে রামায়ণ লিখেছিলেন। বাইরের চোখে বিষয়টি দাসো এবং রিলায়েন্সের যৌথ উদ্যোগ। কিন্তু আসলে এটি নরেন্দ্র মোদী এবং অনিল আম্বানির যৌথ উদ্যোগ। অন্যদিক থেকে এটি দেশের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা বরাত দেওয়া হলো দেশের সবচেয়ে বড় দেউলিয়া কোম্পানিকে। বাজারে অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলোর মোট ধার ১,৪০,০০০ কোটি

টাকা। সহজ বাংলায় বিষয়টি এভাবে বলা যায় দেশের টাকা দিয়ে রাফালে যুদ্ধ বিমান কেনা হয়েছে এবং যাদের কাছ থেকে বিমান কেনা হয়েছে সেই 'দাসো'কে বলা হয়েছে অনিল আম্বানিকে এর থেকে ৩০,০০০ কোটি টাকা দিয়ে দিতে। মেহুল চোকসি বা বিজয় মালিয়া কষ্ট করে নিজেরা চুরি করেছিল; এক্ষেত্রে অনিল আম্বানিকে কষ্ট করে চুরি করতে হয়নি, প্রধানমন্ত্রীই কষ্ট করে চুরিটা করিয়ে দিয়েছেন। এই একটি বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী ফারদিনান্দ মার্কোসকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কোসের অক্টোপাস গ্যাং আর যাই হোক অন্তত দেউলিয়া ছিল না। মোদী যতই দুর্নীতির অভিযোগের জট ছাড়াতে চাইছেন, ততই জট বাড়ছে। ভয় পাচ্ছেন সংসদীয় কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করাতে।

এই রাজ্যে সারদা এবং মমতা ব্যানার্জির দল ও সরকারের ভূমিকা প্রায় এক। ২০১১ সালে একটি দেউলিয়া মোটর সাইকেল কোম্পানি 'গ্লোবাল অটোমোবাইল'কে কিনে নেয়। গ্লোবাল অটোমোবাইলের উৎপাদনকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় সারদা। কিন্তু ১৫০জন কর্মচারীকে রেখে দেয়। যাদের কাজ ছিল 'কাজ করছেন' এই অভিনয় করে দেখানো। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের এনে দেখানো হতো, কত কর্মব্যাস্ত এই কোম্পানি। মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকার এই অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারদা গ্রুপ কলকাতা পুলিশকে বিনা পয়সায় সাইকেল দেয়, তাদের 'সামাজিক দায়িত্ব' প্রমাণ করতে। জঙ্গলমহলের 'উন্নয়নের' জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অ্যাম্বুলেন্স এবং মোটরসাইকেল তুলে দেওয়া হয়। তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত উপঢৌকন কেবল না, তাদের পুজো কমিটিকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া। সারদা গ্রুপ যখন এই কাজগুলো করছে তখনও ক্রোনি ক্যাপিটালিজম কথাটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

কিন্তু বিষয়টা যত কৌশলী হোক না কেন আসলে তো বিষয়টা চুরি। কিন্তু চুরি মানেই তা ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। ধরা পড়ে গেলে কি হবে? এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ফারদিনান্দ মার্কোস। তার আমলে মানুষের মত প্রকাশের ন্যূনতম অধিকারও ছিল না। কাজেই যা খুশি করা যায়, পুকুর চুরি করা যায়– কিন্তু কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এই সুযোগ সবক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী পাবেন না। মমতা ব্যানার্জির সুবিধা একটি রাজ্যে তিনি আবদ্ধ এবং সেই রাজ্যে তিনি নির্বাচন হতে দেন না। কিন্তু বিষয়টা তার কাছেও পরিষ্কার এ সুযোগ তিনি দীর্ঘদিন পাবেন না। আজ না হোক কাল মানুষ তার মতো জবাব দিচ্ছে, দেবেই। ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে দুর্বল হলেও সংসদীয় গণতন্ত্র আছে সেখানে চুরিকে আড়াল করতে হবে কৌশল করে।

এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই অনিল আম্বানির মতো চোরেরা দেশের মানুষের শত্রু। কিন্তু বিষয়টিকে নরম করা যায় তখনই যখন দেখানো যাবে এদের থেকে বড় শত্রু দেশে আছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা আসল। এই 'শত্রু'র নির্বাচনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই শত্রু বাস্তবও হতে পারে কল্পিতও হতে পারে। ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থানের বিবেচনায় সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু হতে পারে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী। ভারতবর্ষে বহু ধর্মের মানুষের বাস। কিন্তু সুদূর অতীত থেকে ধর্মগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক শত্রুতামূলক নয়, বড়জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক শত্রুতামূলক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয় ব্রিটিশ আমলে, তাদের বিভাজনের নীতির ফলে। নির্দিষ্টভাবে বলা যায় হিন্দুত্ববাদী শক্তির

উত্থানের পরবর্তী সময়, অর্থাৎ বিগত একশ বছরে। এবং এর সাথে সমানতালে মাথা চাড়া দেয় মুসলিম মৌলবাদী শক্তি। যে শত্রুতামূলক সম্পর্ক গত একশো বছর ধরে ভারতবর্ষের সমাজ এবং রাজনীতিকে আলোড়িত করেছে সেখানেই আছে সেই কল্পিত শত্রু যা দেশের বৃহত্তম অংশের মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

অনিল আম্বানিদের শত্রু না ভেবে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বোঝানো যায় মুসলমানেরাই সবচেয়ে বড় শত্রু। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম লুটেরাদের আড়াল করতে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির বয়স একশো বছর। দীনদয়াল উপাধ্যায় থেকে বাজপেয়ী-আদবানিরা এই সাম্প্রদায়িকতার বিষকে লালনপালন করেছে, নরেন্দ্র মোদীরা এই বিষকে যুক্ত করেছে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের সাথে, ধান্দার পুঁজিবাদের সাথে, অবশেষে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি খুঁজে পেয়েছে তার পরম মোক্ষকে।

আর্থিক লুটকে আড়াল করতে সাম্প্রদায়িকতা এটি একটি কার্যকারী হাতিয়ার, বিজেপি'র এই অভিজ্ঞতা আকৃষ্ট করেছে অন্য দুর্নীতিভিত্তিক রাজনীতিকে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ এই রাজ্যের তৃণমূল। তৃণমূলের হিসেবে বিজেপি-আরএসএসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, ফাঁকা আছে মুসলমানেরা– তৃণমূল প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল এদের ওপর। চিট ফান্ড লুট করেছে গরিব মানুষের টাকা এবং এই কাজে তৃণমূলের ভূমিকা প্রকাশ্য। সেটাকে আড়াল করতে তৃণমূল নেমে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার ডালি নিয়ে। ইমাম এবং মোয়াজেমদের সামান্য কিছু টাকা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে টাকা কমিয়ে তারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। বেশ কিছু মুসলিম মৌলবাদী, কিছু ধাপ্পাবাজ ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে এই পালটা সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়িয়ে তুলল, লক্ষ্য একটাই চিট ফান্ডের সাথে তাদের সম্পর্ককে গরিব মুসলমানদের চোখের সামনে থেকে আড়াল করা। আর দুর্নীতিকে আড়াল করতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে আগের থেকেই ব্যবহার করছিল বিজেপি।

কিন্তু পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের শতকরা হার দেশের গড়ের থেকে বেশি হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে এই অংশের মানুষকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টাটা জরুরি। শ্রেফ সরকারি প্রচার দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না এটা নরেন্দ্র মোদীর অভিজ্ঞতা, মমতা ব্যানার্জিরও অভিজ্ঞতা। তাঁর কন্যাশ্রী প্রচারের অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে মেয়েদের ওপর নজিরবিহীন লাগাতার আক্রমণ।

ছ'জন শবরের অনাহারের মৃত্যুর ছবি মমতা ব্যানার্জির 'জঙ্গলমহল হাসছে'র ওপর ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। মানুষকে বাস্তব থেকে দূরে রাখতে একটাই প্রচার হাতে থাকে তাহলো ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই কাজ আগের থেকেই তৃণমূল করছিল এবার তারা বিজেপি'র দেখানো পথে হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করল। রাম নবমী উপলক্ষে বিজেপি সশস্ত্র ধর্মীয় মিছিল করছে পালটা ধর্মীয় মিছিল তৃণমূলের। বিজেপি হনুমান জয়ন্তী করলে তৃণমূলও তাই। বিজেপি রথযাত্রার আয়োজন করলে তাকে পাল্টা যাত্রায় ঠেকানোর চেষ্টা তৃণমূলের। আর এস এস অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে যে কাজ করছে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রমকে নিয়ে আবেগ তৈরি করতে সেই কাজ করতে চায় তৃণমূল। ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মীয় ঘৃণা তৈরি করে অপরাধী রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী

উদ্যোগপতিদের অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা করা হবে। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমকে উৎসাহ দেয় এরকম প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিভেদকামী। এটা কোনও আকস্মিক বিষয় নয়, ক্রোনি ক্যাপিটালিজম অপরাধীদের আড়াল করতেই এই কাজ তারা করতে বাধ্য। এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে মমতা ব্যানার্জি সবারই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক অপরাধীদের এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক অপরাধীদের আড়াল করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন সমান কার্যকরী থাকতে পারে না। কাজেই সর্বশেষ 'গায়ের জোর' প্রয়োগ হবে। এই গায়ের জোরের রাজনৈতিক নাম স্বৈরাচারী প্রবণতা। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের জন্ম যদি ফারদিনান্দ মার্কোসের ফিলিপিন্স হয় তার একটিই হাতিয়ার ছিল তা ছিল রাজনৈতিক স্বৈরাচার। কোন প্রতিবাদই সেখানে অনুমোদিত ছিল না। মানুষের মত স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হবার মত কোন গণতান্ত্রিক কাঠামো সেখানে ছিল না। শেষমেষ ক্রোনি ক্যাপিটালিম-এর শেষ হাতিয়ার খুল্লামখুল্লা স্বৈরাচার। আমাদের দেশেও বিষয়টা তাই। উদাহরণ হিসাবে দুটি রাজ্যের কথা বলা যায়। পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরা। প্রথম রাজ্য তৃণমূল শাসিত, দ্বিতীয় রাজ্যটি বিজেপি শাসিত। এই দুটি দল তথাকথিত 'পরস্পর বিরোধী'। পশ্চিমবাংলায় মানুষ ভোটের বাক্সে মত দিতে পারে না, গোটা তৃণমূল রাজত্বেই এই সুযোগ তারা পায়নি। গণতান্ত্রিক অধিকারের ন্যূনতম প্রকাশ নেই বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৯৮% আসনে বিজেপি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। দেশের ইতিহাসে স্বৈরাচারের সবচেয়ে কুৎসিত প্রকাশ হয়েছে ত্রিপুরায়। তৃণমূল এবং বিজেপি'র মৌখিক সম্পর্ক যাই হোক ক্রোনি ক্যাপিটালিজের স্বার্থে এরা যে এক এটা নতুন করে প্রমাণ করার দরকার নেই।

কার সাথে কার শত্রুতা, কার সাথে কার বন্ধুত্ব–প্রকাশ্যে বা গোপনে, এই গোটা বিষয়টা দিনের আলোয় এনে দিয়েছে ৮-৯ জানুয়ারি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলোর ডাকে আহুত ভারত সাধারণ ধর্মঘট। ধর্মঘটের দাবিগুলো ছিল প্রধানত বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে। ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দাবিসমূহ প্রসারিত হয় সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকার বিরুদ্ধেও। সব মিলিয়ে এই ধর্মঘট ছিল মোদী রাজত্বের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক লড়াই। কিন্তু এরাজ্যের অভিজ্ঞতা হল, এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে নামে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের সরকার। এটা বাড়তি এক বড় অভিজ্ঞতা। মুখে বিজেপি'র সমালোচনা আর কার্যক্ষেত্রে নেমে বিজেপি'র বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াইকে ধ্বংস করার চেষ্টা – এই হল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি-তৃণমূলের অঘোষিত আঁতাত সম্পর্কে আর কি কোন ধোঁয়াশার অবকাশ থাকতে পারে!

২৫শে জানুয়ারি, ২০১৯

দাম : ৫ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।